X ফাইল

বিশ্ব মিডিয়া বিস্ফোরক ফারিয়া আলম

বাংলাদেশের মেয়ে ফারিয়া আলমের নাম এখন ইংল্যান্ডের সংবাদ শিরোনামে। তিনি তার 'কাহিনী' বিক্রি করে দু'সপ্তাহে আয় করছেন ৬ কোটি টাকা। বাংলাদেশে এই অর্থ কামাতে অনেক 'হাওয়া' লাগে। ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে হয়, লুটপাট করতে হয়। ফারিয়া উপার্জন করেছেন স্বনামে, নিজের ক্ষমতায়। উল্টে-পাল্টে দিয়েছেন ইংল্যান্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন।

নোমান মোহাম্মদ লিখেছেন এই তথ্য নিবন্ধ

"ভালোবাসাবাসির সেই ক্ষণগুলো ছিল অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ। আবেগের কোনো ঘাটতিও ছিল না। মনে হচ্ছিল এটাই আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা। অথচ বাস্তবতা ভিন্ন। সভেন আমার জীবনের সেরা পুরুষ। তার দক্ষতা অতুলনীয়। সে আমাকে বার বারই বলছিল 'তুমি দুর্দান্ত। আমি দীর্ঘ সময় এ মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিলাম।'

আমার দিকে সভেনের ছিল তীক্ষ্ণ নজর। সে কখনোই আমাকে বাদ দিয়ে শুধু নিজের আনন্দের কথা ভাবেনি। নিজের সঙ্গে সঙ্গে আমার আনন্দও সে নিশ্চিত করেছিল। ভালোবাসার ক্ষেত্রে তাকে গুরু মানতে আমার কোনো দ্বিধা নেই।”

কথাগুলো বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ফারিয়া আলমের। বন্ধু মহলে যার পরিচিতি ফারিয়া ‘ফেরারি’ আলম। আর যার সঙ্গে সম্পর্কের কথা বর্ণনা করেছেন, তিনি বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে প্রভাবশালী দেশ ইংল্যান্ড জাতীয় দলের কোচ সভেন গোরান এরিকসন।

এখন ফারিয়া বিখ্যাত। অনেক বিখ্যাত। ব্রিটেনের পত্রপত্রিকাগুলো ফারিয়াকে নিয়ে প্রতিদিনই সংবাদ ছাপছে। গত প্রায় মাসখানেক ধরে ট্যাবলয়েডগুলোর নিয়মিত কভার গার্ল ফারিয়া। ইংল্যান্ড জাতীয় দলের ফুটবল কোচ সভেন গোরান এরিকসন ও এফএ-র প্রধান নির্বাহী মার্ক প্যালিওসের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কারণে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার আলোচিত চরিত্র তিনি।

বিশ্ব মিডিয়ায় স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের সবচেয়ে আলোচিত ঝড় তোলা নারী ফারিয়া আলম। নিজের কাহিনী বিক্রি করে মাত্র দু’সপ্তাহে যিনি আয় করছেন প্রায় ৬ কোটি টাকা।

বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ এক অপরিচিত নাম। একেবারেই অপরিচিত অবশ্য নয়। তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে এ দেশের একটা পরিচিতি ছিল। সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে পরিচিত আছে। ক্ষুধা-দারিদ্র্যের, ঝড়-বন্যা-জলোচ্ছ্বাসের দেশ হিসেবে পরিচিতি আছে। যতগুলো পরিচয় সবই নেতিবাচক অর্থে। নষ্ট, পচে যাওয়া দেশের তকমা আমাদের গায়ে। ফ্রেডরিকস্ ’৯২-র বার্সিলোনা অলিম্পিকে পদক পেয়েছিল বলেই তার দেশ নামিবিয়ার নাম বিশ্ব জেনেছে। ডেভর সুকার, জানিমির বোবানরা ’৯৮-এর বিশ্বকাপে তাদের দেশকে তৃতীয় করাতে পেরেছিল বলেই ক্রোয়েশিয়ার কথা সবাই জেনেছে। বাংলাদেশের তেমন কেউ নেই। ফ্রেডরিকস্ নেই, সুকার নেই। কেউই নেই। এদেশের কোটি কোটি বঙ্গ সন্তানের ক’জনই বা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে পরিচিতি করেছে? খুব কম। তেমন একজন ফারিয়া আলম। যিনি বাংলাদেশকে তুলে এনেছেন হুজুগে ব্রিটিশ ট্যাবলয়েডের শিরোনামে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছেও এখন আলোচিত নাম ফারিয়া আলম। নানা রকমের গল্প চলছে তাকে নিয়ে। এ গল্পে অংশ নিচ্ছেন প্রায় সবাই। ফারিয়া-এরিকসন-প্যালিওস প্রেমকাহিনীর উত্তেজক অংশ আমরা উপভোগ করছি প্রাণভরে। নিজেরা পড়ছি, অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করছি। আবার পরক্ষণেই ফারিয়াকে গালমন্দ করছি ‘বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের মান-মর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে দেবার জন্য।’

ফারিয়া আলমের জন্ম ঢাকায়, ১৯৬৬ সালে। খাজা মাহবুব আলম ও সরফুন্নেসা বেগমের দুই ছেলে, দুই মেয়ের একজন ফারিয়া। তার বাবা তখন পাকিস্তান ব্যাংকে চাকরি করতেন।

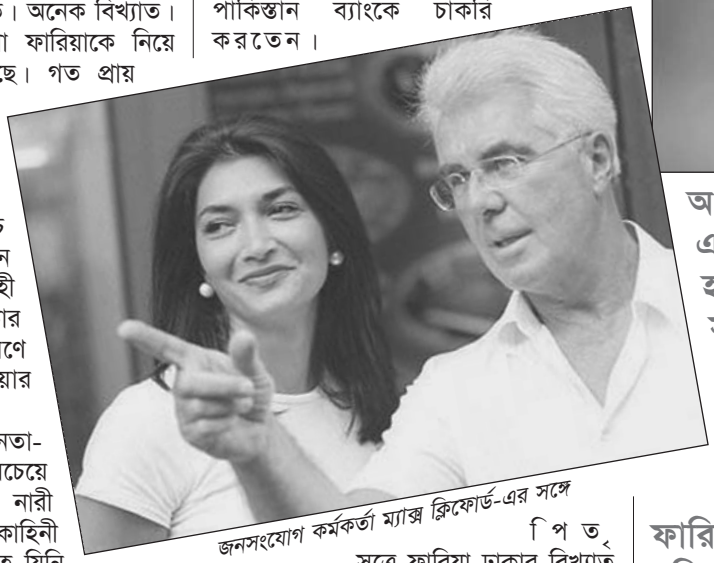

জনসংযোগ কর্মকর্তা ম্যাক্স ক্লিফোর্ড-এর সঙ্গে

পিতৃসূত্রে ফারিয়া ঢাকার বিখ্যাত নবাব পরিবারের উত্তরাধিকার। আরমানিটোলায় তাদের আদি বাড়ি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন খাজা মাহবুব আলম সপরিবারে ইংল্যান্ড চলে যান।

প্রবাসী হলেও দেশের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রটা ঠিকই ধরে রেখেছিলেন। দেশে ছিল প্রচুর আত্মীয়স্বজন। খাজা মাহবুব তাই মাঝে মাঝেই দেশে আসতেন। তিনি চাইতেন, তার সন্তানরা যেন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ত্যাগ না করে।

ইংল্যান্ডে আলম পরিবার ব্রাডফোর্ড ও পরে নর্দামবারল্যান্ডে বসবাস করতেন। ফারিয়া পড়াশোনা করেছেন ব্রাডফোর্ড স্কুল, পন্টিল্যান্ড হাই স্কুল ও নিউক্যাসেলে। আধুনিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হন তখনই। এর মধ্যে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েন ফারিয়ার বাবা। মেয়েকে বিয়ে দিতে অস্থির হয়ে পড়েন তিনি। অসুস্থ বাবার দিকে তাকিয়ে ‘না’ বলতে পারেননি ফারিয়া।

অথচ ইংল্যান্ডে তখন তার একজন বয়ফ্রেন্ড ছিল। তাকে জীবনসঙ্গী করার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন ফারিয়া। কিন্তু পারিবারিক চাপে বিয়ের জন্য বাংলাদেশে ফিরে আসতে বাধ্য হন। দেশে ফিরে নতুন কিছু ফ্রেন্ড সার্কেল গড়ে তোলেন। সেই সার্কেলে মধ্য ’৮০তে সিনেমায় নামা জনপ্রিয় এক

অর্থ উপার্জনের জন্য এরিকসনের শয্যাসঙ্গী হননি ফারিয়া। তিনি সত্যিই ভালোবেসেছেন এরিকসনকে। এরিকসনের স্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। এখনও তাই চান। সাক্ষাৎকারে ফারিয়া বলেছেন, ‘এরিকসন যদি এখন আমাকে বিয়ের প্রস্তাব করে, তাহলে আমি না বলতে পারবো না’

চিত্রনায়ক ও তার বন্ধুরা ছিলেন। ফারিয়ার সান্নিধ্য তাদের কাছেও ছিল কামনীয়।

ঢাকায় ফারিয়াকে বিয়ে দেয়া হয় একজন ডাক্তারের সঙ্গে। বয়সে যে ফারিয়ার চেয়ে ১৩ বছরের বড়। পারিবারিক সেন্টিমেন্টকে তুচ্ছ করে এ সময়ই প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন তিনি। বরকে কোনোভাবেই মেনে নেন না। বাসররাত এবং পরবর্তী দু’সপ্তাহে তার শরীর স্পর্শই করতে দেননি সেই পাত্রকে। সেই ছেলেই বা সেটা মানবেন কেন? টিপিক্যাল বাঙালি কায়দায় বৌকে মারধর করেন তিনি। কিন্তু ফারিয়াও তো আর টিপিক্যাল মানসিকতার বঙ্গ ললনা নয়। রীতিমতো বিলেত দাবড়ে বেড়ানো তরুণী। প্রতিবাদ করলেন তিনি। ঢাকায় ফারিয়ার বন্ধু মহলের কয়েকজন সেই পাত্রের বাসায় হামলা করেছিল বলেও জানা যায়। ফলে বিয়েটা আর টেকেনি। লালমাটিয়ায় এক আত্মীয়ের বাসায় যে বিয়ে হয়েছিল, তার স্থায়িত্ব এক মাসও হয়নি। অনেকটা বাধ্য হয়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করেন তিনি।

কিছুদিন পর অদ্ভুত এক সমস্যার

মুখোমুখি হন ফারিয়া। থাকার মতো বাসস্থান হারিয়ে যায় তার। কারণ বিচ্ছেদ হয়ে যায় বাবা-মা'র। কর্মসূত্রে বাবা চলে যান সুইডেনে। মা সরফুন্নেসা বেগম ও ভাই আসোয়াত চলে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটল। মায়ের সঙ্গে যাবার অনুমতি আদায়ে ব্যর্থ হন ফারিয়া। অর্থাৎ ভিসা পাননি। শেষে আলম পরিবারের পারিবারিক ডাক্তার কবির চৌধুরীর ম্যানচেস্টারস্থ বাসস্থানে ঠাঁই হয় ফারিয়ার।

ত্রিভুজ প্রেমে ফারিয়া-এরিকসন-প্যালিওস। ডানে এরিকসনের সঙ্গে লাঞ্চে, বাঁয়ে প্যালিওসের সঙ্গে ডিনারে

ততদিনে ফারিয়া নিজের লক্ষ্য ঠিক করে নিয়েছেন। বুঝেছেন নিজের ক্ষমতা। পুরুষরা যে তার প্রতি আকৃষ্ট , এটা বোঝার মতো বয়স হয়েছিল। তিনি শুধু দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরীই ছিলেন না, কথাবার্তা, চালচলন, পোশাক-পরিচ্ছদে ছিলেন দুর্দান্ত স্মার্ট। আশ্রয়দাতা ড. কবির চৌধুরীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন ফারিয়া। বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যায় ড. চৌধুরীর। আশ্রয়স্থল হারান ফারিয়াও। উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে ১৯৯৭ সালে পূর্ব লন্ডনের বেথনাল গ্রিন অ্যান্ড বো এলাকায় কনজারভেটিভ পার্টির মনোনয়নে এমপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এই কবির চৌধুরী।

এর আগে-পরে অনেকের সঙ্গে ফারিয়া বিছানায় গেছেন। সেটা ছিল নিতান্তই শারীরিক আকর্ষণ কিংবা আবেগের কারণে। ড. কবির চৌধুরীর বাসার আশ্রয়স্থল হারালেও ততোদিনে ফারিয়ার জন্য আরো অনেক আশ্রয়স্থল গড়ে উঠেছিল। জীবনের ভাঁজগুলো চিনতে শুরু করেছিলেন তিনি। ফলে তাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। দক্ষিণ লন্ডনের স্টিটহামে এক আন্টির বাসায় ওঠেন তিনি। সেখান থেকে চলে যান সারে। ভক্সহল ও বেটারসিতেও পরবর্তীতে বসবাস করেন ফারিয়া।

এই ঘুরে বেড়ানো, বন্ধনহীন জীবনেই তার মনে জাগে মডেল হবার স্বপ্ন। এর মধ্যে কম্পিউটারের ওপর বেশ পড়াশোনা করেছেন। ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যানালিস্ট, সেক্রেটারি ও জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। মডেলিংও শুরু করেন। ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড় প্রাচ্য পোশাকের প্রতিষ্ঠান 'জস গ্রাহাম'-এর পণ্যের মডেল হয়েছিলেন তিনি। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে তার পরিচিতি, নেটওয়ার্ক। ১৯৯৬ সালে ইংল্যান্ডে জিটিভি সুপার মডেল প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়ে চূড়ান্ত পর্বে উন্নীত হয়েছিলেন ফারিয়া। যদিও শিরোপা জিততে পারেননি। কিন্তু বন্ধুবান্ধবরা তখন থেকেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন একদিন নিশ্চয়ই অনেকদূর যাবেন ফারিয়া।

ইংলিশ ফুটবলের প্রধান সংস্থা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনে (এফএ) ফারিয়া আলম যোগদান করেন গত বছর। নির্বাহী পরিচালক ডেভিড ডেভিসের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে তার চাকরি। চাকরি পাইয়ে দেয় ফারিয়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইকবাল ওয়াহাব। তিনিও বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত। মিলিওনিয়ার এই ব্যক্তির ইংল্যান্ডের ওয়েস্টমিনিস্টারে একটি ক্লাব রেস্টুরেন্ট রয়েছে। এখানেই বছর দুয়েক আগে ইকবাল ওয়াহাবের সঙ্গে প্রথমবারের মতো ডেট করেন ফারিয়া। সম্পর্কের সূত্রটা এখনো বজায় আছে।

ওয়েস্টমিনিস্টারের এই রেস্টুরেন্ট ইংল্যান্ডের শীর্ষ রাজনীতিবিদ এবং এফএ-র নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়মিত আড্ডাখানা। বড় বড় রাঘব বোয়ালদের সঙ্গে ফারিয়ার পরিচয় এখানেই। অত্যন্ত আধুনিক, শর্টকাট পোশাকে ধনকুবেরদের পার্টিতে শ্যাম্পেন হাতে ইকবাল ওয়াহাবের সঙ্গে উপস্থিত থাকতেন তিনি।

এরিকসন-প্যালিওস দু'জনের সঙ্গে ফারিয়ার সম্পর্কের সূত্রপাত ২০০৩ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। হোয়াইটহলের ব্যানকুয়েটিং হাউসে সেদিন ছিল এফএ'র ক্রিসমাস ডিনার। ৫১ বছর বয়সী মার্ক প্যালিওসের প্রতি আগে থেকেই আকৃষ্ট ছিলেন ফারিয়া। তার পেটানো শরীর ও ভরাট গলার স্বর মোহাবিষ্ট করেছিলো ফারিয়াকে। অন্যদিকে ফারিয়াকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন ইংল্যান্ডের কোচ এরিকসন। ফলে শুরু হয় ত্রিভুজ প্রেমের গল্প। যে গল্প ৫ কোটি পাউন্ডের বিনিময়ে ইংল্যান্ডের ট্যাবলয়েড নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড ও মেইল অন সানডে'র কাছে বিক্রি করেছেন ফারিয়া। সে গল্পের শুরুটা শোনা যাক ফারিয়ার মুখে।

"এফএ-র চাকরিতে যোগদানের পর আমি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলাম প্যালিওসের প্রতি। সেই ক্রিসমাস ডিনারে তার সঙ্গে বসে আমি ফুটবল নিয়ে আলোচনা করছিলাম। টেবিলে আমার বাঁ পাশে বসেছিলেন এরিকসন। জানতাম তিনি আমাকে পছন্দ করেন। বিষয়টি আমি ততোটা পাত্তা দেইনি। হঠাৎ হতভম্ব হয়ে লক্ষ্য করলাম আমার ডান উরুতে পুরুষালী হাতের স্পর্শ। হাতটা এরিকসনের। বিস্ময়ে আমার বাকরুদ্ধ হবার যোগাড়। শুধু তাকে এ প্রশ্নটাই করতে পেরেছিলাম, 'তুমি কি করছ?' ঠোঁটে আঙুল রেখে এরিকসনের উত্তর, 'শ... শ... শ। তোমার পোশাকটি চমৎকার। তোমাকে দুর্দান্ত লাগছে।'

ডিনারের পর প্যালিওস বেশিক্ষণ ছিল না। সে সুযোগে এরিকসন আমার সঙ্গে এসে গল্প করে। সন্দেহ নেই, বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ফুটবল কোচ আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, এটা মনে করে আমি পুলকিত হয়েছিলাম। যদিও আমার আকর্ষণ ছিল প্যালিওসের প্রতি।

এক সপ্তাহ পর এফএ-র ক্রিসমাস লাঞ্চ ছিল সহো হাউসে। এবার টেবিলের নিচ দিয়ে এরিকসনের খেলাটাই খেললো প্যালিওস। আমি সাড়া দিলাম। কেননা আমার দুর্বলতা ছিলো প্যালিওসের প্রতিই।

জানুয়ারিতে টাওয়ার ব্রিজের নিকটবর্তী এক রেস্টুরেন্টে প্যালিওস আমাকে ডিনারে নিয়ে গেলো। ডিনার শেষে কফির জন্য আমার বাড়িতে তাকে আমন্ত্রণ জানালাম। বাড়িতে ঢুকে প্যালিওস বললো যে, সে আমাকে পছন্দ করে। এ কথা বলে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে। আমি তার তপ্ত নিঃশ্বাস অনুভব করছিলাম। দু'জন ফিরে গেলাম আদিম যুগে। তবে সেই সময় প্যালিওস শুধু নিজের কথাই ভেবেছেন। আমার আনন্দের দিকে তার কোনো খেয়াল ছিল না। তখন নিজেকে একখন্ড মাংসের টুকরো ছাড়া অন্য কিছু মনে হয়নি আমার। এর কিছুক্ষণ পর 'আমাকে যেতে হবে' বলে কেতাদুরস্ত কাপড় পরে প্যালিওস চলে গেলো। যাবার আগে বলে গেলো, 'আমি দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কে বিশ্বাস করি না। মেয়েদেরও বিশ্বাস করি না।' তার কথা আমাকে স্তম্ভিত করলো।

পরে চিন্তা করলাম, প্যালিওস একজন ডিভোর্সড ব্যক্তি। ৫ সন্তানের পিতা। জীবনে অনেক বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হতে পারে। সে জন্য আমি তাকে আরেকটি সুযোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিলাম। ৩ সপ্তাহ পরে আমার ফ্ল্যাটে লাঞ্চের জন্য ডাকলাম। প্যালিওস রুমে ঢুকেই ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বললো, 'চলো বিছানায় লাঞ্চ সারা যাক।' কিন্তু আমাকে আনন্দের সাগরে ভাসাতে এবারো প্যালিওস ছিল ব্যর্থ। এছাড়া আমার আবেগের প্রতি কখনোই মনোযোগী ছিল না সে। বুঝলাম ভুল মানুষকে পছন্দ করেছি। এসব কারণে প্যালিওসকে ছেড়ে আমি ঝুঁকলাম এরিকসনের দিকে।''

'জস গ্রাহাম'-এর মডেল রূপে ফারিয়া

ফারিয়া তো সারাজীবন হেঁসেলঘরে পড়ে থাকা টিপিক্যাল বাঙালি নারী নন। ঢাকার নবাব পরিবারের রক্ত তার শরীরে। রাজরক্তের প্রভাবেই হয়তো সারা জীবন নিজেকে প্রিন্সেস হিসেবে চালিয়েছেন। ভেঙেছেন উপরি কাঠামোর কাঁচের দেয়াল। ফারিয়া জানেন কিভাবে নিজেকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় এবং তিনি সেভাবে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন আজকের অবস্থানে

প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর থেকেই ফারিয়া চেয়েছেন নিশ্চিত জীবন। যে জীবনে অর্থ-নিরাপত্তা থাকবে। তার যোগ্যতা ছিল। সে কারণে সেলিব্রেটিদের সঙ্গে তার সখ্যও ছিল। '৯০-এর দশকের শেষের দিকে বলিউড সুপারস্টার সালমান খানের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিলো বলে জানা যায়। কিন্তু সেটা ছিলো অল্প কিছুদিনের জন্য।

অর্থ উপার্জনের জন্য এরিকসনের শয্যাসঙ্গী হননি ফারিয়া। তিনি সত্যিই ভালোবেসেছেন এরিকসনকে। এরিকসনের স্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। এখনও তাই চান। সাক্ষাৎকারে ফারিয়া বলেছেন, 'বিয়ের অভিজ্ঞতা আমার জন্য অত্যন্ত তিক্ত। আর কখনো বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু এরিকসন যদি এখন আমাকে বিয়ের প্রস্তাব করে, তাহলে আমি না বলতে পারবো না।' পত্রিকার কাছে কাহিনী বিক্রির আগে তিনি এরিকসনের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছেন। সে অনুমতি দেবার পরই প্রেসের সামনে মুখ খুলেছেন ফারিয়া।

এরিকসনের সঙ্গে ফারিয়ার সম্পর্কের শুরুটা আগেই বলা হয়েছে। সেই ক্রিসমাস ডিনারের পর জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে সহোর ক্যাটনার রেস্টুরেন্টে ফারিয়াকে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ জানান এরিকসন। লাঞ্চ শেষে ফারিয়াকে প্রেম নিবেদন করেন। ফারিয়া জানতেন এরিকসনের গার্লফ্রেন্ড আছে। ন্যান্সির সঙ্গে এরিকসনের প্রণয় সম্পর্ক বহুদিনের। সেই ন্যান্সির কথা জিজ্ঞেস করলেন ফারিয়া। এরিকসনের ছোট্ট উত্তর, 'আমাদের মাঝে এখন কোনো সম্পর্ক নেই। আমি তোমাকে চাই।' ফারিয়া তখন কোনো উত্তর দেননি। কারণ প্যালিওসের সঙ্গে তার সম্পর্কটা তখন মাঝামাঝি অবস্থায়। প্যালিওসের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছার পর লন্ডনের বিখ্যাত ভারতীয় রেস্টুরেন্ট ইয়াট্টাতে দ্বিতীয়বার এরিকসনের সঙ্গে লাঞ্চ

ফারিয়া তার মা'র জীবন বেছে নিতে চাননি। সে জন্য জীবনের শুরু থেকেই তিনি ছিলেন সতর্ক। পা ফেলেছেন গুনে গুনে। এ কারণেই তিনি আজকের ফারিয়া। বন্ধুরা যাকে ডাকে ফারিয়া 'ফেরারি' আলম

বিশ্ব মিডিয়া বিস্ফোরক ফারিয়াকে ঘিরে সংবাদকর্মীদের ভিড়

গার্ল ফ্রেন্ড ন্যান্সির সঙ্গে এরিকসন

করেন ফারিয়া। এবারও ফারিয়া-এরিকসন কথাবার্তা বেশিদূর এগোয়নি।

ফারিয়া কখনোই এরিকসনকে সরাসরি 'না' বলেননি। আর ইংল্যান্ডের এই সুইডিশ কোচও হাল ছাড়েননি। ফলে দু'জনের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগটা রয়ে গেল। মে মাসে ছুটি কাটানোর জন্য ফারিয়া পাড়ি জমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায়। সেখানে তাকে ফোন করে এরিকসন আবারো প্রেম নিবেদন করেন। ইংল্যান্ড জাতীয় দল তখন ইউরো ২০০৪-এ অংশ নেবার জন্য পর্তুগাল যাবার অপেক্ষায়। ইংল্যান্ডের ট্রেনিং ক্যাম্প চলাকালীন সেই সময়ে পুরো স্কোয়াড থাকতো হার্ডফোর্ডশায়ারের সোপওয়েল হোটেলে। এরিকসনের ডাকে সাড়া দিয়ে ফ্লোরিডা থেকে উড়ে এসে ফারিয়া ইংল্যান্ডের কোচের সঙ্গে দেখা করেন এই ট্রেনিং ক্যাম্পে। ইংল্যান্ড দলের সফলতা কামনা করে এরিকসনকে বিদায় দেন ফারিয়া।

নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড ও মেইল অন সানডে'কে ফারিয়া বলেছেন যে, ইউরো চলাকালীন প্রতিদিনই এরিকসন তাকে ফোন করতো। পর্তুগালের কাছে হেরে ইংল্যান্ডে যখন ইউরো থেকে বিদায় নেয়, তখন সবাই বিমর্ষ হয়ে পড়ে। এরিকসন তখন বিধ্বস্ত। ছুটি কাটাতে স্বদেশ সুইডেনে চলে যান এরিকসন। সেখান থেকে ফোন করে ফারিয়াকে আমন্ত্রণ জানান সুইডেন আসার জন্য। বাকিটা শুনুন ফারিয়া আলমের বর্ণনায়...

"সুইডেনে যাবার প্রস্তাবটা আমার কাছে আকস্মিক। আমি এরিকসনকে জিজ্ঞেস করলাম ন্যান্সি কোথায়? সে বললো, 'আমি জানি না। জানতেও চাই না।' এরিকসন তখন এমনিতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তার ওপর আগের ৬ মাসে এরিকসনের প্রতি আমি একটু একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। ফলে আমি সুইডেন যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাকে দেখে সভেন খুশি হলো। সে নিজেই ড্রাইভ করে তার বাড়ি নিয়ে গেলো। বাড়িতে প্রবেশ করার পর সে আমাকে দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আবেগপূর্ণ চুমু দিলো। সেটা ছিলো চমৎকার এক অভিজ্ঞতার শুরু।

এরিকসন মুগ্ধ বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি অসম্ভব সুন্দর!' কোনো রকম প্রটেকশন ছাড়াই পরের সময়টা কাটলো অসম্ভব আনন্দে। সে রকম ব্যবস্থা নেবার কথা আমাদের দু'জনের কারো মনেই আসেনি।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম এরিকসন ঘুমিয়ে আছে। আমি তাকে 'বিশেষ' কিছু উপহার দিতে চাচ্ছিলাম। ঘুমের মধ্যেই আমি তাকে 'ফারিয়া স্পেশাল' দিলাম। চমকে উঠে ঘুম ভাঙলো এরিকসনের। বললো, 'হায়! তুমি কি করছো!' কিন্তু বুঝলাম এরিকসন এটা পছন্দ করেছে। এটা একজন পুরুষের ওপর নারীর আধিপত্য বিস্তারের চূড়ান্ত রূপ বলে আমি মনে করি।

এরিকসনের সঙ্গে আমার অত্যন্ত হৃদয়াবেগে ভাবাপূর্ণ কিছু সময় কেটেছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে সেদিন বিকেলেই আমাকে লন্ডন ফিরে আসতে হয়। আর এখন তো ঘটনা প্রকাশিতই হয়ে পড়লো।"

এরিকসনের সঙ্গে ফারিয়ার প্রেম কাহিনী প্রথম প্রকাশ করে 'নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড।' এ বছর ১৮ জুলাই তারা বিস্ফোরণ ঘটায়। দু'দিন পর এফএ দু'জনের সঙ্গে কথা বলে ঘটনাটি অস্বীকার করে। ২৫ জুলাই ঐ একই পত্রিকা ফারিয়ার কিছু ই-মেইল ছাপে। সেখানে এরিকসনের সঙ্গে সম্পর্কের কথা ফারিয়া কিছু বন্ধুকে জানিয়েছিলো। ফলে ঘটনাটি স্বীকার করে নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় এরিকসন-ফারিয়ার ছিলো না।

৫ আগস্ট বোর্ডের জরুরি সভা আহ্বান করে সে দেশের ফুটবল এসোসিয়েশন। এরিকসনের অবৈধ সম্পর্ক নয়, বরং এ সম্পর্কের ব্যাপারে এরিকসন যে মিথ্যাচার করেছেন সে সম্পর্কে ১২ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে। ৫ আগস্টের আগেই আরেকটি বোমা ফাটায় নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড। তারা দাবি করে শুধু এরিকসন নয়, এফএ'র প্রধান নির্বাহী মার্ক প্যালিওসের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিলো ফারিয়ার। এ ঘটনা সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র জানলে তাদের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করে ফুটবল এসোসিয়েশন। এফএ'র ডিরেক্টর অব কমিউনিকেশন্স কলিন গিবসন নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ডকে বলেন, তারা যেন এরিকসনের ঘটনা প্রকাশ করার বিনিময়ে প্যালিওসের ঘটনা চেপে যায়। এ ঘটনার সত্যতার বিপক্ষে দাঁড়াতে পারেননি প্যালিওস। ফলে পদত্যাগে বাধ্য হন তিনি। একই সঙ্গে পদত্যাগ করেন কলিন গিবসন। পদত্যাগ করেন ফারিয়া আলমও। তবে ৫ আগস্ট বোর্ড মিটিং শেষে 'এরিকসনকে জিজ্ঞেস

করার মতো কোনো প্রশ্ন নেই' বলে ঘোষণা করলে এ যাত্রা চাকরি রক্ষা হয় এরিকসনের।

ফারিয়ার মা সরফুন্নেসা বেগম সারা জীবন শান্তির খোঁজ করেছেন। কোনো এক জায়গায় থিতু হতে চেয়েছেন, পারেননি। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে। সন্তানদের নিজের কাছে রাখতে পারেননি। সংসার চালানোর জন্য তাকে সুপারমার্কেটে ঘন্টায় ৭ পাউন্ডের চাকরিও করতে হয়েছে। ফারিয়া তার মা'র জীবন বেছে নিতে চাননি। সে জন্য জীবনের শুরু থেকেই তিনি ছিলেন সতর্ক। পা ফেলেছেন গুনে গুনে। এ কারণেই তিনি আজকের ফারিয়া। বন্ধুরা যাকে ডাকে ফারিয়া 'ফেরারি' আলম।

বিলাসবহুল, অভিজাত গাড়ি 'ফেরারি'র নাম আজ জুড়েছে তার নামের সঙ্গে।

তবুও যেন ঠিক তৃপ্ত নন ফারিয়া। জীবনের প্রায় চার দশক পার করে এখন তিনিও চান থিতু হতে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মতে, ফারিয়া অনেকদিন ধরেই এটা চাচ্ছেন। কিন্তু বার বারই ভুল সঙ্গী নির্বাচন করছেন। তার প্রণয়কাহিনী পত্রিকাগুলো ফ্ল্যাশ করলেও এখনো এরিকসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ আছে ফারিয়ার। দেখা যাক, ফারিয়া বহুদিন ধরে যে মানুষটাকে খুঁজছে সেটা এরিকসন কি না? যদি নাও হয়, সমস্যা নেই। কেননা তিনি ভাবেন তার নিজের জীবন নিয়ে। সে জীবন তাকে সামনে এগোতে শিখিয়েছে। জীবন থেকে কিছুতেই পিছু হটবেন না ফারিয়া।

ভালোবাসার জন্য কোনো যোগ্যতা লাগে না। বেদে কন্যাও ভালোবাসতে পারে রাজপুত্রকে। রূপকথায় তাদের মিলনও হয়। বাস্তবে নয়। বিশ্ব ফুটবলে সভেন গোরান এরিকসন এক সম্ভ্রান্ত নাম। তাকে ভালোবাসার অধিকার সবারই আছে। কিন্তু এরিকসনের ভালোবাসা পাবার যোগ্যতা সবার নেই। ফারিয়া আলমের আছে। বিশ্বের সহস্র-লাখ নারীকে পেছনে ফেলে ফারিয়া ঠিকই এরিকসনের ভালোবাসা পেয়েছেন। যদিও এরিকসনের গার্লফেন্ড আছে। ন্যান্সি'র মতো সুন্দরী গার্লফ্রেন্ড থাকার পরও এরিকসন ঝুঁকেছেন ফারিয়ার প্রতি। এখানেই

ফারিয়া ভালোভাবেই জানেন, তার চারপাশের পরিবেশ বাংলাদেশের মতো নয়। প্রেমের কাহিনী বলার জন্য তার সামাজিক স্ট্যাটাস সামান্যতম কমবে না। বরং বাড়বে। এখানেই জীবনের আয়রনি, মধ্যবিত্তের ডায়লামা

ফারিয়ার যোগ্যতা। যে যোগ্যতায় তিনি পেছনে ফেলেছেন সহস্র-লাখ নারীদের।

একজন মানুষের জীবনের লক্ষ্য কি? কেউ হতে চায় ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, চাকরিজীবী। সব নদী যেমন সাগরে মেশে তেমনি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, চাকরিজীবী, রাজনীতিবিদ এদের সবার লক্ষ্যও এক ও অভিন্ন। অর্থ উপার্জন করা, সামাজিক প্রতিপত্তি নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ সেটা পারেন না। যারা পারেন, তারা বেশি মাত্রায়ই পারেন। ফলে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান দিন দিন বাড়ছেই। বেশিরভাগের এই 'পারা' আবার বৈধ উপায়ে নয়। ফারিয়া পেরেছেন। বৈধ উপায়েই পেরেছেন। কারণ আর কিছু নয়, তার যোগ্যতা। এফএ'র সেক্রেটারি হতে হলে নিশ্চয় সে রকম যোগ্যতাই লাগে। ফারিয়ার সেটা ছিলো। সে জন্য বছরে তিনি উপার্জন করতেন ৩৫ হাজার পাউন্ড, অর্থাৎ প্রায় ৪০ লাখ টাকা। আর 'নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড' ও 'মেইল অন সানডে' পত্রিকায় এরিকসন-প্যালিওসের সঙ্গে প্রেম কাহিনী বলার বিনিময়ে পাবেন প্রায় সাড়ে ৫ লাখ পাউন্ড। বাংলাদেশী মুদ্রায় যায় মূল্যমান ৬ কোটি টাকার কাছাকাছি। তবে এই অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে তিনি এরিকসন-প্যালিওসের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেননি, একথা ফারিয়া বলেছেন। তাদের সঙ্গে 'মেক লাভ' করেছেন মনের টানে সাড়া দিয়ে, শরীরের টানে সাড়া দিয়ে। এখন সেই কাহিনী বলার বিনিময়ে লাখ লাখ পাউন্ডের বাস্তবতা!

ফারিয়া তো সারাজীবন হেঁসেলঘরে পড়ে থাকা টিপিক্যাল বাঙালি নারী নন। ঢাকার নবাব পরিবারের রক্ত তার শরীরে। রাজরক্তের প্রভাবেই হয়তো সারা জীবন নিজেকে প্রিন্সেস হিসেবে চালিয়েছেন। ভেঙেছেন উপরি কাঠামোর কাঁচের দেয়াল।

ফারিয়া শিক্ষিত, স্মার্ট। তিনি জানেন কিভাবে নিজেকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় এবং তিনি সেভাবে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন আজকের অবস্থানে। সখিনা কিংবা মোমেনার মানসিকতা নিয়ে থাকলে এই কাহিনী ফ্ল্যাশ হবার পর তাকে আত্মহত্যা কিংবা নিদেনপক্ষে আত্মগোপন তো করতেই হতো। কিন্তু জীবনের অলি-গলি ফারিয়া অনেক দেখেছেন। সে কারণে তিনি জানেন, কখন কি করতে হবে। ফারিয়ার কাছে আত্মহত্যা, আত্মগোপনের অর্থ জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়া। কেটে যাওয়া জীবনে তিনি তা করেননি। সে জন্যই এসেছেন প্রকাশ্যে। ফারিয়া ভালোভাবেই জানেন, তার চারপাশের পরিবেশ বাংলাদেশের মতো নয়। প্রেমের কাহিনী বলার জন্য তার সামাজিক স্ট্যাটাস সামান্যতম কমবে না। বরং বাড়বে। এখানেই জীবনের আয়রনি, মধ্যবিত্তের ডায়লামা। সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা পেলে ফারিয়াকে তাচ্ছিল্য করা হতো খোদ ইংল্যান্ডেও। কিন্তু ৫ লাখ পাউন্ডকে অস্বীকার সহজে করা যায় না। তাছাড়া কিছুদিন পর সবাই তাকে ভুলে গেলেও তখন ঐ সাড়ে ৫ লাখ পাউন্ড তার কাজে লাগবে। ১৫ বছরের বেতন দু'সপ্তাহেই যে উপার্জন করতে পারে, জীবনে সামনে এগিয়ে যাবার পথে প্রতিবন্ধকতাগুলো তার জন্য খুব বড় হয়ে দেখা দেবে না।

উত্থান-পতনে পরিপূর্ণ ফারিয়ার জীবন। পতনের অতল গহ্বরে হারিয়ে গেলেও তিনি হতোদ্যম হননি। বাঁচতে চেয়েছেন স্বাধীনভাবে। প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজেকে। প্রতিনিয়ত জীবনের চালেঞ্জকে মোকাবেলা করেছেন অফুরন্ত জীবনীশক্তি দিয়ে। এভাবেই তিনি এসেছেন আজকের অবস্থানে! হয়েছেন 'ফেরারি' আলম!